শুরুর আগে

আরিফ আজাদ

প্রত্যাবর্তন শব্দটা বেশ চমৎকার। প্রত্যাবর্তন বলতে সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও গিয়ে পুনরায় ফিরে আসা বোঝায়। সকালবেলা যে পাখিটা নীড় ছেড়ে বেরোয়, সন্ধ্যেবেলা তার নীড়ে ফিরে আসাটাই প্রত্যাবর্তন। শব্দটাকে চমৎকার বলার কারণ, এটা দিয়ে বোঝায়, নীড়ে ফিরে আসাটা খুব জরুরি। ব্যক্তিগতভাবে, কেন যেন প্রত্যাবর্তন শব্দটা শুনলেই আমার চোখের তারায় এমন একটা দৃশ্য ভাসতে থাকে।

ঠিক একইভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরে কিংবা একটা সময় পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন থাকার পর অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ধর্ম থেকে ইসলামে যারা ফিরে আসে, তাদের আগমনটাকেও আমরা 'প্রত্যাবর্তন' হিশেবে অভিহিত করি।

ইসলামে 'ফিতরাত' তথা 'সহজাত প্রবৃত্তি' বলে একটা ধারণা আছে—প্রতিটি মানবশিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তার মানে হলো—জন্মগতভাবে প্রতিটি শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মায়। খ্রিষ্টান, ইহুদি কিংবা হিন্দু—যে পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ফিতরাতের ধারণা অনুযায়ী, সে মুসলিম হয়েই ধরণির বুকে আগমন করে। পরে বয়স এবং বুঝ হওয়ার সাথে সাথে তার পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতি, লোকাচারের মধ্যে যাপন করতে করতে সে ফিতরাতের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়ে। খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিলে সে হয়ে যায় খ্রিষ্টান, ইহুদি পরিবারে জন্ম নিলে সে হয়ে পড়ে ইহুদি, হিন্দু পরিবারে জন্ম নিলে সে হয়ে ওঠে একজন পুরোদস্তুর হিন্দু। আশপাশের মানুষের বিশ্বাস আর ভক্তির প্রভাব তার ওপর পড়ে এবং সে ফিতরাতের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়।

যেহেতু প্রতিটি মানবশিশু মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে সে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়, কিন্তু তার সত্যিকার নীড় তো ইসলাম, তাই জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন তার সংবিৎ ফেরে, যখন সে বুঝতে পারে সত্য-মিথ্যের প্রভেদ, যখন সে তার রবকে সত্যিকার অর্থে আবিষ্কার করতে পারে, তখন সে ফিরে আসে তার আদি এবং আসল নীড়ে। তার এই ফিরে আসাকেই আমরা বলছি—প্রত্যাবর্তন।

ইসলামে যারা প্রত্যাবর্তন করে তাদের গল্পগুলো সবসময়ই চাঞ্চল্যকর! সবার আগে তারা লড়াই করে নিজ সত্তার সাথে। নিজের সাথে সকল বোঝাপড়া সেরে যখন সে সত্যকে আলিঙ্গানের জন্য অগ্রসর হয়, তখন তার সামনে পাহাড়সম বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন সকলে। সকল বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে একদিন সে আশ্রয় নেয় শাশ্বত সেই সত্যের বুকে। তার এই সংগ্রাম, এই ত্যাগ আর তিতিক্ষার উপাখ্যানগুলোকে যদি কাছ থেকে উপলব্ধি করা না যায়, সেগুলোকে আমাদের কাছে মনে হবে নিছক রূপকথা। সেগুলো রূপকথাই বটে, তবে সত্যের চাদরে মোড়ানো রূপকথা, যেখানে নেই মিথ্যের ছিটেফোঁটা।

'প্রত্যাবর্তন' সিরিজের প্রথম বইটি নিয়ে যখন কাজ করেছি, এরকম একঝাঁক শাশ্বত সতেজ সবুজ প্রাণের জীবনগল্পের নান্দনিকতায় সিক্ত হয়েছি। তাদের প্রতিটা সংগ্রাম, প্রতিটা লড়াই যেন খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছি আমি। প্রতিটি মানবাত্মা যেভাবে ছুটে গেছে তাদের রবের পানে, বিস্ময়ে বিমূঢ় না হয়ে পারিনি আমি!

সেই বইটিতে আমরা মোটাদাগে মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিজের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়া মানুষদের গল্পগুলোকে স্থান দিয়েছি বেশি। কীভাবে তারা নিজেদের জীবনে আবার ধর্মের গুরুত্ব, আল্লাহর দিকে নিজেকে মেলে ধরার তাড়না অনুভব করেছেন সেই গল্পগুলোই প্রাধান্য পেয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, সেই বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। অনেক মানুষের জীবন-পরিবর্তনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে গল্পগুলো, আলহামদুলিল্লাহ। সেই ধারাবাহিকতায় সিরিজের দ্বিতীয় বই এখন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে *প্রত্যাবর্তন ২* নামে।

প্রত্যাবর্তন বইটির সাথে *প্রত্যাবর্তন ২*-এর পার্থক্য হচ্ছে—আগের বইয়ে আমরা মুসলিম পরিবারে বড় হওয়া কিন্তু একপর্যায়ে ধর্মবিমুখ হয়ে পড়া মানুষগুলোর গল্প পড়েছি। এবারের বইতে আমরা পড়ব এমন কিছু সাহসী মানুষের গল্প, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ধর্ম, আরো স্পষ্ট করে বললে খ্রিষ্টধর্ম থেকে কীভাবে ইসলামের আলো

খুঁজে পেলেন, কীভাবে গির্জার ঘণ্টা ছেড়ে তারা আপন করে নিলেন আযানের ধ্বনি। একটা ভিন্ন ধর্ম থেকে অন্য একটা ধর্মে নিজেকে নিয়ে আসাটা বরাবরই চ্যালেঞ্জের। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জকে বুক পেতে নিয়েছিলেন এই মানুষগুলো—তাদের সেই ঘটনাবলির সাথেই পরিচিত হব এখানে।

প্রত্যাবর্তন বইটি আমি সম্পাদনা করেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে এবারের বইটির সম্পাদনায় যুক্ত হওয়া সম্ভব হলো না; তবে প্রকাশের আগেই বইটি পড়বার সুযোগ পেয়েছি সমকালীন প্রকাশন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায়, আলহামদুলিল্লাহ। তাদের প্রতি অফুরান কৃতজ্ঞতা। আগের বইয়ের মতো এই বইটিও পাঠকপ্রিয়তা পাবে এবং লাখো মানুষের দ্বীনে ফেরার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে এই কামনা। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তম বিনিময় দিন। আমিন।

সূচিপত্র

প্রফেসর খাদিজা ওয়াটসন - ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত মিশনারি ১৩

চ্যাপলেইন ইউসুফ এস্টেস - মিউজিক মিনিস্টার ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ২৪

ইসহাক হেলাল মাসিহা - আফ্রিকান খ্রিস্টান মিশনারি ও মিশরীয় যাজক ৪৪

রাফায়েল নারবেজ - পাইয়োনিয়ার মিনিস্টার, জিহোভা'স উইটনেস ৫৩

রেভারেন্ড ডেভিড বেনজামিন কেলডানি - মিশনারি আর্চবিশপ ৬৬

ড. জেরাল্ড এফ ডার্কস - ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চ মিনিস্টার ৭০

ফাদার জর্জ অ্যান্থনি - শ্রীলঙ্কান ক্যাথলিক যাজক ৮২

ইবরাহিম খলিল আহমাদ - মিশরীয় কপটিক যাজক ৮৯

ভিয়াচাস্লাভ পোলোসিন - রাশান আর্চপ্রিস্ট ৯৭

মার্টিন জন মুয়াইপোপো - লুথারান আর্চবিশপ, তানজানিয়া ১০২

রহমত পুর্নোমো - ডাচ বংশোদ্ভূত ইন্দোনেশিয়ান যাজক ১০৯

জিন ম্যারি ডাচম্যান - ফরাসি যাজক ১২২

ঘানার এক প্রাক্তন মিশনারি ও যাজক ১২৯

ডক্টর ওয়াদি আহমাদ - মিশরীয় ডিকন বা উপ-যাজক ১৩৭

মুহাম্মাদ আমান হোবম - জার্মান কূটনীতিবিদ ও সমাজকর্মী ১৪৫

প্রফেসর খাদিজা ওয়াটসন

ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত মিশনারি

ডাক্তার সাহেবের সাথে পরিচয় হয় জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সে। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিলেন তারপরও আমাদের ভালোই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বেশ ভদ্র স্বভাবের তিনি। খুব দানশীলও বটে। প্রায়ই ভিক্ষুকদের দান করতে দেখতাম। এমনকি দান করার জন্য নিজের গাড়িতে প্লাস্টিকব্যাগ-ভরতি পয়সা রাখতেন। আমি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আবার একজন খ্রিষ্টান মিশনারিও—এসব জানার পর তিনি আমাকে বেশিরভাগ সময় ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করতেন। তিনি দুবাইয়ে থাকতেন—এটা জানার পর আমি তাকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতাম। ইসলাম সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল না। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনের সময় আমাদের ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্যাথলিজিম, নাস্তিকতা, সর্বপ্রাণবাদ, প্রকৃতিপূজাসহ সব বিষয়ে পড়ানো হয়। আমার আগ্রহ ছিল সর্বপ্রাণবাদ নিয়ে।

তার আচার-আচরণে তাকে কেন জানি খ্রিষ্টান মনে হতো না। একদিন তাকে বলেই ফেললাম, 'যদিও আমি মুসলিমদের সম্পর্কে খুব একটা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি একজন মুসলিম।'

উত্তরে আমাকে অবাক করে দেন তিনি। স্বীকার করেন, দুবাই থাকাকালীন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরিবারকে বিষয়টি জানাননি। তার বাবা-মা ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। জানতে পারলে ভয়াবহ অবস্থা হতো। তবে দেশে ফিরে তিনি ইসলামের কোনো নিয়মনীতিই আর মানছেন না। সবাই জানে তিনি খ্রিষ্টান।

ডাক্তার সাহেবের ইসলাম গ্রহণের কথা জানার অল্প কিছুদিন পর আরেকজন নারীর

সাথে পরিচয় হয়। তিনিও খ্রিষ্টান থেকে মুসলিম হয়েছেন। তিনিও ডাক্তার সাহেবের মতো মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সৌদি আরবে কাজ করতেন।

জানি, ছোট ছোট সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনেন। ডিভিনিটির ওপর মাস্টার্স শেষে ইচ্ছে ছিল জার্মানি যাব। তাই জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হয়ে যাই। এই জায়গায় এত কম সময়ে দুজন নওমুসলিমের কথা জানিয়ে ঈশ্বর আমাকে কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন? মজা করে মনে মনে বললাম, 'গড, আপনি এখন আমাকে কী শেখাতে চান?'

খ্রিষ্টান মিশনারি শিক্ষক আর পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচারণার মাধ্যমে আমার মাঝে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইসলামে নারীরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। তারা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, অবহেলার শিকার। তাদেরকে সবসময় পর্দার আড়ালে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হয়। স্বামীর সব আদেশ পালন করতে হয়।

তাই ভেবে উঠতে পারছিলাম না, একজন নারী কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে! সেজন্য আমার পরিচিত সেই রিভার্টেড মুসলিমাহর কাছে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ইসলাম সম্পর্কে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন। তিনি উত্তরে জানান, ইসলাম নারীকে অনেক মর্যাদা দিয়েছে। পর্দার বিধান মূলত নারীর নিরাপত্তার জন্যই। তাছাড়া, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অত্যাচার ইসলামের অংশ নয়। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, অধিকার সম্পর্কে ধারণা দেন তিনি। আমি বুঝতে পারি, খ্রিষ্টান শিক্ষকরা মুসলিম নারীদের সম্পর্কে আমাদের যেসব বলেছে, সেগুলো কতটা ভুল। তাই ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে আমি তাকে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করি। সেসময় আমি কলেজে ধর্ম বিষয়ে পড়াচ্ছিলাম। স্বভাবতই আমার প্রশ্নগুলো ছিল কিছুটা গভীর। একজন নওমুসলিমের পক্ষে সেগুলোর উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। সেজন্য তিনি আমাকে ইসলামিক সেন্টারে নিয়ে যেতে চাইলেন।

খ্রিষ্টান শিক্ষকেরা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অনেক বিভ্রান্তিমূলক কথা বলেছিলেন। তারা বলতেন, আল্লাহ পৌত্তলিক দেবতাদের মতন এক ঈশ্বর! হিন্দুরা যেমন অনেকগুলো দেবতার উপাসনা করে, তেমনি মুসলিমরা যেই দেবতার উপাসনা করে, তার নাম আল্লাহ! মুসলিমরা কাবার দিকে মাথা নোয়ায়, কাবাকে ঘিরে প্রার্থনা করে। কাবা তাদের মিথ্যা ঈশ্বরের অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু! ইসলাম একটা শয়তানি ধর্ম। তাই ইসলামিক সেন্টারে যাওয়ার আগে, ঈশ্বরের কাছে (মানে সেই

সময় যিশুর কাছে) শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইলাম। প্রার্থনা করলাম, 'প্রভু, এটা যদি আসলেই শয়তানি হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে পথ দেখান। আমি কখনো সেখানে যাব না।'

কোনো অশুভ ইঙ্গিত না পেয়ে নির্দ্বিধায় আমি সেই বোনের সাথে ইসলামিক সেন্টারে গেলাম; তবে বেশ সতর্কও ছিলাম। একজন খ্রিষ্টান মিশনারি হিসেবে Church Evangelism বা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে জানা আছে আমার। আমি জানি, নিজ ধর্মের দিকে ডাকার সময় কেমন কৌশল অবলম্বন করতে হয়, কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে শ্রোতাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করতে হয়, নাস্তানাবুদ করতে হয়। ইসলামিক সেন্টারে এসব কৌশলের কোনোটাই প্রয়োগ করা হলো না দেখে অবাক হলাম। সেখানে যারা কাজ করেন, তাদের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সহজ-সরল। কোনো প্রকার মানসিক ছলাকলা, হেনস্থা, জবরদস্তি কিংবা মগজধোলাই—কিছুই তারা করলেন না।

আমার মাঝে সবসময় ঈশ্বর সম্পর্কে গভীরভাবে জানার আগ্রহ ছিল। আমার প্রথম কৌতূহল জাগে মুসলিমরা যার ইবাদত করে, সেই 'আল্লাহ' সত্তাকে ঘিরে। ইসলামিক সেন্টারে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ সম্পর্কেই প্রশ্ন করি। জানতে পারি, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, চিরঞ্জীব, এক ও অদ্বিতীয়। সব রকমের শরিকবিহীন একক ইলাহ তিনি। অথচ খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে আল্লাহকে আমাদের কাছে পৌত্তলিক দেবতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। আমি আবিষ্কার করলাম, ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্থতাকারীর আশ্রয়ও মুসলিমরা নেয় না।

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়েও আমার অনেক কৌতূহল ছিল। আমি জানতে পারলাম, যিশুর কাছে খ্রিষ্টানরা যেমন প্রার্থনা করে, নবি মুহাম্মাদের কাছে মুসলিমরা মোটেই তেমন করে প্রার্থনা করে না। তিনি যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নন; বরং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা হারাম। সালাতের মাঝে মুসলিমরা মুহাম্মাদের ওপরে দরুদ পাঠ করে, সেই সাথে ইবরাহিমের ওপরেও দরুদ পাঠ করে। মুহাম্মাদ ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। এই চৌদ্দশ বছরে মুহাম্মাদের পরে আর কোনো নবি আসেননি। ঈসা ও মুসা প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু বনি ইসরাইলের জন্য। অথচ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য। তাই তিনি বিশ্বনবি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রথম ৩০০ বছরে গির্জাগুলোতে মুসলিমদের মতোই শিক্ষা দেওয়া হতো, যিশু ঈশ্বরের একজন দূত, সন্তান নন। ত্রিত্ববাদের সূচনা করে সম্রাট কন্সট্যান্টাইন। সে একজন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। ধর্মের কিছুই জানত না সে। এই ব্যক্তি সেই প্রাচীন ব্যাবিলনীয় আমলের পৌত্তলিকতাকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে জুড়ে দেয়। এটা অনেকেই জানে যে 'ত্রিত্ববাদ' (Trinity) শব্দের কোনো অস্তিত্ব বাইবেলে পাওয়া যায় না, এমনকি এর মূল গ্রিক কিংবা হিব্রুলিপিতেও নেই।

'শোনো হে ইসরাইল' বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আমাদের প্রভু পরমেশ্বরই একমাত্র প্রভু।'[১]

প্রার্থনা ছিল আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। ইসলামিক সেন্টারে আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল মুসলিমদের প্রার্থনা বিষয়ে। মুসলিমদের অন্যসব বিষয়ের মতো এ ব্যাপারেও খ্রিষ্টানরা কিছু জানে না। আমাদের কাবার হজ করার ছবি দেখানো হতো। আমরা মনে করতাম, মুসলিমরা এই কালো চতুষ্কোণ বস্তুটাকে তাদের ঈশ্বর মনে করে তার কাছে প্রার্থনা করে!

খ্রিষ্টান অবস্থায়ও আমার কাছে প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ক্যাথলিক থাকাকালীন নতজানু হয়ে ক্রসের মতো চিহ্ন এঁকে প্রার্থনা করতাম। পরবর্তী সময়ে প্রটেস্ট্যান্ট হওয়ার পর, হাত ওপরে তুলতাম, তালি দিতাম, গান গাইতাম, নাচতাম, চিৎকার করতাম। অজ্ঞতাবশত মনে করতাম, এসবই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের রাস্তা। আমি যখন জানতে পারলাম, আল্লাহ নিজেই সালাতের বিধান ঠিক করে দিয়েছেন, তখন অনেক বেশি অবাক হলাম। সালাতে মুসলিমরা আল্লাহর প্রশংসা এবং মহিমা ঘোষণা করে, সুরা ফাতিহা পড়ার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ কামনা করে। সালাতের আগে ওযুর মাধ্যমে তারা পবিত্র হয়। আর ইবাদতের সমস্ত নিয়ম স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই নিজের মতো করে তাঁর ইবাদত করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তো পবিত্র সত্তা। তাঁরই বিধান অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করতে হবে। আর এটিই তো যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়েছেন,

---

[১] মার্ক ১২ : ২৯

যেভাবে আসমানের ফেরেশতারা সালাত আদায় করেন। তার মানে মুসলিমরাই একমাত্র জাতি, যারা আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টি ফেরেশতাদের মতো করে প্রার্থনা করে। আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারিত হয় সূর্যের অবস্থান দেখে। পৃথিবীর আবর্তনের কথা চিন্তা করলে, মুসলিমরাই একমাত্র জাতি, যারা ২৪ ঘণ্টা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে।

প্রথমদিন আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, কুরআনের সত্যতা নিয়ে। প্রায় ১২ বছর ধরে প্রতিবছর একবার করে সম্পূর্ণ বাইবেল পড়েছি আমি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার আট বছর আমাদের বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি বাক্য পড়ানো হয়েছে। এসময় অনেক সাংঘর্ষিক কথাবার্তা আমার চোখে পড়ে, কিন্তু আমি সেগুলো নিয়ে গবেষণার সময় পাইনি। পরবর্তী সময়ে নিজে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার পর, একদিন আমি আমাদের কলেজের এক প্রফেসরকে বলেছিলাম, 'আমরা যা পড়াই খ্রিস্টধর্মে এর চেয়ে বেশি কিছু আছে। খ্রিস্টান দলগুলোর বেশকিছু ধর্মীয় মতবাদ একে-অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। ক্যাথলিকরা যিশুর সাথে মা মেরিসহ অনেক সাধুর উপাসনা করে বলে প্রটেস্ট্যান্টরা তাদেরকে খ্রিস্টানই মনে করে না। ব্যাপ্টিস্টরা নন-ব্যাপ্টিস্টদের নিজেদের দলভুক্ত মনে করে না। এ ছাড়াও বিভিন্ন দল রয়েছে, যারা বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। এমনকি দলভেদে বাইবেলেও ভিন্নতা আছে। আমরা বাইবেলের যেই ব্যাখ্যা দিই সেটাই যদি সত্য হয়, তাহলে এতগুলো দলের প্রয়োজন কী? আমার মনে হয়, খ্রিস্টান সমাজে পরিবর্তন আনা দরকার। সাধারণ মানুষের নৈতিকতার অধঃপতন ঘটছে দিনদিন। ৫০ বছর আগেও এতটা সামাজিক অবক্ষয় ছিল না। বিশেষ করে, তথাকথিত খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলোতে নৈতিকতার অধঃপতন সবচেয়ে বেশি ঘটছে।' আমার কথা শুনে প্রফেসর থ বনে গিয়েছিলেন, কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

বাইবেল ৬৬টি পুস্তিকার সমষ্টি (ক্যাথলিকদের কাছে সংখ্যাটা ৭২)। আর এগুলো লিখেছে ৪০ জনের বেশি লেখক, যাদের অনেকেরই পরিচয় জানা যায় না। ওল্ড টেস্টামেন্টের এবং নিউ টেস্টামেন্টের মূল ভাষা হিব্রু ও গ্রিক। দুটোই প্রাচীন ভাষারীতিতে লেখা, যে ভাষায় এখন কেউ কথা বলে না। তাছাড়া আমি কোনোদিন শুনিনি, যিশু গ্রিক ভাষায় কথা বলেছেন। কুরআন সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে, এটার সবকথা আল্লাহর কথা—এটা জেনে অভিভূত হয়েছিলাম। একটি ছাড়া কুরআনের সব অধ্যায় (সুরা) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' (শুরু করছি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে) দিয়ে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলের

অধ্যায়গুলো শুরু হয়, The Book of . . . (ওল্ড টেস্টামেন্টে ক্ষেত্রে) আর the Gospel according to. . . [Matthew, Mark, Luke or John] (নিউ টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে)। বাইবেল স্কলারদের মতে, মার্ক, ম্যাথিউ, লুক—এরা কেউ যিশুর শিষ্য ছিল না। এরা ছিল পিটার ও পলের শিষ্য। মার্ক হচ্ছেন প্রথম গসপেল লেখক। তিনি সম্ভবত ৬৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গসপেলগুলো লিখেছেন। স্কলাররা মনে করেন, ম্যাথিউ মার্কের লেখা নকল বা চুরি করে লিখেছেন। আর মার্কের তথ্যগুলোও অন্য অজানা উৎস থেকে নেওয়া। লুকও তার গসপেলে বলেছেন, তার বর্ণিত কথা বা কাজগুলোও অন্য উৎস থেকে নেওয়া। জনের গসপেলটা লেখা হয়েছে প্রায় ১০০ খ্রিষ্টাব্দে। এই তথ্যগুলো অনেক সাধারণ খ্রিষ্টানই জানে না, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বিভাগে আমাদের এসব পড়ানো হয়েছে।

কুরআনের আরেকটি সুন্দর বিষয় হলো, প্রায় ১৪০০ বছরেও কুরআন অক্ষত অবস্থায় আছে। এর মধ্যে কোনো সংযোজন-বিয়োজন হয়নি। আমরা হুবহু সেই কুরআনই পড়ি, যা রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছিল। কুরআনের ভাষা আরবি। পুরো পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষ আছে, যারা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছে। মাতৃভাষা যা-ই হোক না কেন, লাখ লাখ মুসলিম রয়েছে, যারা কুরআনের ভাষা জানে।

আলোচনা শেষ হলে ইসলামিক সেন্টারের লোকেরা আমাকে বাসায় কুরআন পড়তে বললেন, যেমনিভাবে মিশনারিরা বাইবেল পড়তে বলে থাকে। তারা বেশকিছু বইও আমাকে পড়তে দিলেন। আর জানালেন আমার কোনো প্রশ্ন থাকলে খুশিমনে সেগুলোর উত্তর দেবেন। এক রাতের মধ্যেই সবগুলো বই পড়ে ফেলি আমি। এই প্রথমবার ইসলাম সম্পর্কে জানতে মুসলিমদের লেখা বই পড়লাম। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ৮ বছর পড়াশোনার সময় ইসলাম নিয়ে যেসব বই পড়েছি, সেগুলো খ্রিষ্টানদের লেখা ছিল। সেই বইগুলো জানায়—খ্রিষ্টানরা ইসলাম সম্পর্কে কী ভাবে। বাস্তবতা হচ্ছে—তারা যা ভাবে, ইসলাম তার থেকে অনেক অনেক ভিন্ন। সত্যি বলতে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আমি পরদিন আবার ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। গতদিন যেসব বই পড়েছি, সেগুলো নিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা করলাম। তারা আবার আমাকে কিছু বই দিলেন। পরদিন আমি আবার সেখানে গেলাম, তাদের সাথে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করলাম। তারা আবার আমাকে বই দিলেন। এভাবে প্রায় এক সপ্তাহ

চলে গেল। ততদিনে আমি ১২টি বই পড়ে ফেলেছি আর আলোচনা করেছি প্রায় ১৫ ঘণ্টা। ৮ বছর ধরে আমি খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আর সেই সপ্তাহে জানতে ও বুঝতে পারলাম—ইসলাম সত্য, কিন্তু তখনো ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিইনি। একজন মৌলবাদী খ্রিস্টানের জন্য এটা বেশ কঠিন ছিল।

ইসলাম গ্রহণ না করলেও আমি ইসলামিক লেকচারগুলোয় যেতে থাকি। নতুন নতুন তথ্য জানছিলাম আর ধাক্কা খাচ্ছিলাম। লেকচারগুলো যেন আমার মাস্টার্সে করা পড়াশোনার রিফিউটেশন। আমি জানতাম না, মুসলিমরা বিশ্বাস করে, যিশু বাবা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা যে যিশুকে বিশ্বাস করে, সেটাই জানতাম না। আরো জেনে অবাক হলাম, কেউ যদি যিশু বা ঈসাকে নবি হিসেবে বিশ্বাস না করে তাহলে সে মুসলিমই হতে পারে না; তবে মুসলিমরা ঈসাকে ঈশ্বর হিসেবে মানে না, মানে আল্লাহর একজন নবি হিসেবে। আরো বিশ্বাস করে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি, জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তাকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। আমার জেনে ভালো লাগে, মেরি বা মারইয়ামকে নিয়ে কুরআনে সম্পূর্ণ একটি সুরা আছে। অথচ ক্যাথলিক ও প্রস্টেট্যান্ট বাইবেলে মেরিকে নিয়ে শুধু একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেখানে তাকে 'The Magnificent' বলা হয়েছে। কুরআনে তার নামেই একটি সুরা আছে, সেখানে তার পরিচয়ে ঈসা আলাইহিস সালামকে পরিচিত করা হয়েছে। ঈসা ইবনু মারইয়াম অর্থাৎ মারইয়াম-পুত্র বলে সম্মানিত করা হয়েছে।

ইসলামি ক্লাসগুলো করার পর বাসায় এসে আমি সেগুলো নিয়ে ভাবতাম। খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আমার মনে যেই প্রশ্নগুলো উঠেছিল, সেগুলোর উত্তর পাচ্ছিলাম সেখানে। প্রতিদিন রাতে বাইবেল পড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, 'গড, আমাকে পথ দেখান—ইসলাম সত্য কি না।' আস্তে আস্তে প্রার্থনায় যিশু, পবিত্র আত্মা, ফাদার—এসব শব্দের ব্যবহার বাদ দিয়েছিলাম। শুধু ঈশ্বরের কাছে সত্য পথের সন্ধান চাইতাম। আর কেউ অন্তরের গভীর থেকে সত্যের সন্ধান করলে আল্লাহ তাকে পথ দেখান।

ইসলামিক সেন্টারে প্রথম যাওয়ার প্রায় দুই মাস পরের কথা। একরাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রতিদিনের মতো ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করছিলাম, হঠাৎ আমার হৃদয়ে কিছু প্রবেশ করার অনুভূতি হলো। আমি উঠে বসে বললাম, 'আল্লাহ, আমি বিশ্বাস করি, আপনিই একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র উপাস্য।' সেই প্রথমবার আমি আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করি। আগে অনেককে বলতে শুনেছি, কিন্তু নিজে

কোনোদিন আল্লাহ শব্দটি বলিনি।

আমার ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া মোটেও ভালো ছিল না। যুগে যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের মতো আমাকেও পারিবারিক-সামাজিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। যেই মানুষগুলো যিশুর ভালোবাসার কথা বলে বেড়ায়, তারাই আমার সাথে ঘৃণিত আচরণ করতে শুরু করে। সর্বপ্রথম বিপর্যয় ছিল—চাকরি হারানো। আমি দুটো কলেজে শিক্ষকতা করতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে সেখান থেকে বাদ দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তাদের রীতি অনুযায়ী, আপনি খ্রিষ্টান হয়ে ইসলাম সম্পর্কে পড়াতে পারেন, কিন্তু মুসলিম হয়ে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে পড়াতে পারবেন না। আমার ইসলাম গ্রহণের প্রায় ৭ বছর আগে আমার স্বামী মারা গিয়েছে। ৯ সন্তানের মধ্যে ৩ সন্তানের আর্থিক ভার ছিল আমার ওপর।

এরপর দ্বিতীয় কষ্টদায়ক ঘটনাটা ঘটে। আমার স্বামীর পরিবার আমাকে ত্যাগ করে। তারা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। ফিলিপাইনে তারা বেশ সম্মানিত। আমার শ্বশুরের বাবাকে ফিলিপাইনের ইতিহাসের বইগুলোতে নায়ক-বীর হিসেবে দেখানো হয়। আমার শ্বশুর একসময় গভর্নর ছিলেন। তিনি অবশ্য মারা গেছেন, কিন্তু আমার স্বামীর মৃত্যুর পরও তার পরিবারের লোকদের সাথে আমার গভীর আত্মীয়তা ছিল। তারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায়, আমার বাবার পরিবারের আত্মীয়রা আমেরিকান, তারা আমেরিকাতেই থাকেন। আমি ফিলিপাইনে আসার পর স্বামীর পরিবারের সাথে দৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। তারা আমার নিজ পরিবারের চেয়েও বেশি আপন ছিল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করায় তারা আমার সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছেদ করে। বলে দেয়, আমার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে আমার কোনো জায়গা নেই। এই ঘটনায় আমি ভীষণ কষ্ট পাই। তিনদিন ধরে কেঁদেছিলাম এই কারণে; তবে যখনই সালাত আদায় করতাম, হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করতাম। উপলব্ধি করতাম, ইসলাম গ্রহণ করে কোনো ভুল করিনি।

এদিকে আমার নিজের সন্তানদের সঙ্গে আরেক বিবাদ শুরু হয়। সেসময় আমার ছোট ছেলে ছাড়া অন্য সব ছেলেমেয়ে আমেরিকায় ছিল। ইসলামিক সেন্টারে যেসব জানছিলাম, সেগুলো সম্পর্কে তাদের চিঠি লিখতাম। আমি সবসময় আমার সন্তানদেরকে নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে জানাতে পছন্দ করি। তারা যখন ছোট ছিল, তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছি। ফলে এখন তারা সবাই ধার্মিক খ্রিষ্টান। আমার